এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুন ২০১২

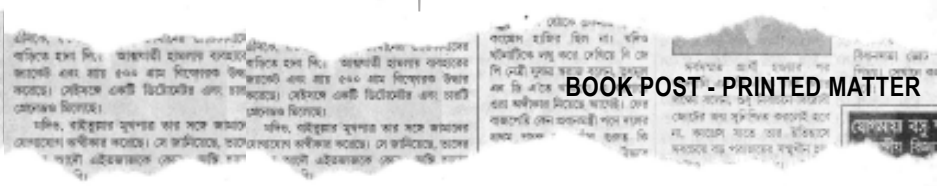

BOOK POST - PRINTED MATTER

কাজীন

১৭/১৭৩

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এইচ কাপাডিয়ার নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডভাইজরি কমিটির কাছে, জিন পরিবর্তিত ফসল চাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা বা চাষ করার অনুমতি দিলে তার নিয়মকানুনই বা কী হবে সেই ব্যাপারে ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৪-এ 'জিন ক্যাম্পেন' ও জিনশস্য বিরোধী অধিকার-কর্মী অরুনা রডরিগস-এর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে কোর্ট অনেকগুলি নির্দেশ জারি করে। ২০০৬-এ অ্যাপেক্স কোর্ট, কমিটিকে জিনশস্য চাষে অনুমতি দিতে নিষেধ করে। আবার ২০০৮-এ ২৪টি আন্তর্জাতিক জিন ফসল চাষের বিষয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয়। ক্ষেতে পরীক্ষামূলক চাষে কোর্ট কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে বলে,যেমন পরীক্ষার ক্ষেত্রটিকে অন্যান্য ফসলের ক্ষেত থেকে ২০০ মিটার দূরে রাখতে হবে এবং জিন ফসল থেকে পাশের ক্ষেতের অন্যান্য ফসলে সংক্রমণের মাত্রা যেন ০.০১ শতাংশের বেশি না হয়। এছাড়া গোটা বিষয়টির তত্ত্বাবধানে একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর উপর দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বে চাল

১৭/১৭৪

পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় বাদামি চাল অন্য চালের তুলনায় স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন ,এই চাল খাওয়ারও বিপদ আছে। কারণ আর্সেনিক। বাসমতীর মতো লম্বা সরু চালের চাইতে মোটা লাল চালে আর্সেনিক জমার আশঙ্কা বেশি। ভারতসহ আন্তর্জাতিক গবেষকদের একটি দল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তিনটি গ্রাম বেছে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁদের গবেষণায় দেখা যায়, গ্রাম তিনটির পানীয় জল আর্সেনিক মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের শরীরে আর্সেনিকের দূষণ ফুটে উঠেছে। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা সেখানে উৎপাদিত চালের নমুনা পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখেন সরু ও মাঝারি চালের তুলনায় বেঁটে মোটা চালের মধ্যে আর্সেনিক অবশেষের পরিমাণ বেশি। পরিবেশ ও জিনগত কারণে বেঁটে মোটা চালের গায়ের আবরণ সরু চালের তুলনায় পুরু হয়, ফলে আর্সেনিক জমার পরিমাণ তুলনায় বাড়ে। আবার সরু চাল পালিশ হওয়ার দরুন তার বাইরের আবরণে জমা আর্সেনিক খসে পড়ে।

বেশ!!

১৭/১৭৫

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে ৩ বছরের কম বয়সি শিশুদের ৪০.৪ শতাংশের ওজন কম এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছরের নারীদের ৫৫.৩ শতাংশ রক্তাল্পতার শিকার। দেশজুড়ে ব্যাপক অপুষ্টির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর দফতর সম্প্রতি কিছু উদ্যোগ নিয়েছে,যার অন্যতম হল সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প বা আইসিডিএসকে শক্তিশালী ও পুর্নগঠিত করা, যার উদ্দেশ্য হবে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলা এবং শিশুদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। ২০০টি বিশেষভাবে চিহ্নিত অনগ্রসর জেলার মা ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে বহু-ক্ষেত্রীয় কর্মসূচি তৈরি করা। অপুষ্টির মোকাবিলায় দেশজুড়ে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রকে মজবুত করা, বিশেষত স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, স্কুল শিক্ষা, কৃষি, খাদ্য ও গণবণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রের সঙ্গে পুষ্টির বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

মাটির কাছে

১৭/১৭৬

মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বৃদ্ধি ও মাটিকে টেকসই করতে সরকার নিবিড় পুষ্টি ব্যবস্থাপনা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে সুষম ও প্রয়োজনমাফিক রাসায়নিক সারের সঙ্গে জৈব পুষ্টি প্রয়োগে মাটির মান বাড়ানো হবে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ছাড়াও কৃষি উৎপাদন বাড়াতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন জলসংরক্ষণ ও বনসৃজনের সাহায্যে খরার মোকাবিলা, ক্ষুদ্র ও ছোট সেচ ব্যবস্থাসহ সেচের খালের সংস্কার, সাবেক জলাশয়গুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রতিরোধে আগাম পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্লাবিত অঞ্চলে জমা জলের সমস্যা দূর করতে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্লাস্টিকে পোকা

১৭/১৭৭

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে বেড়ানো প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ গত ৪০ বছরে একশো গুণ বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, ঘাতক হিসেবে খ্যাত ওই অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের পাহাড় পরিমাণ বর্জ্য যেগুলি আয়তনে ৫ মিলিমিটারেরও কম, মহাসাগরের প্রাকৃতিক পরিবেশকেই ধ্বংস করে দেবে। এমন কি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ ওই সময়ে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তখনও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিক খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজ মহাসাগরের ওই অঞ্চলে ভেসে বেড়ানো মাইক্রো-প্লাস্টিক দখল করে নিয়েছে টেক্সাসের বিশাল এলাকা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভেসে বেড়ানো প্লাস্টিক বর্জ্য হয়ে উঠেছে 'সি স্কেটার' নামে এক ধরনের মহাসাগরীয় কীটের নতুন বাসস্থান। বিপদ হল, এরা জলের উপর ভেসে থাকা শ্যাওলা ও মাছের ডিম খেয়ে ফেলে। আগে এই কীট ডিম পাড়ত ভেসে বেড়ানো কাঠ বা ঝিনুকের মতো শক্ত খোলে,যাদের সংখ্যা একটা স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে থাকত। কিন্তু যত মাইক্রো-প্লাস্টিক বর্জ্য বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এই কীটের সংখ্যা, ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে মাছ ও শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ ও অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর।

হাতে রইল আশ্বাস

১৭/১৭৮

বিভিন্ন এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'রাইট টু এডুকেশন ফোরাম' তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলেছে, গোটা দেশজুড়েই শিক্ষার অধিকার আইনটি ঠিকমতো কার্যকারী করা হচ্ছে না। আইনে যে পরিকাঠামোর উল্লেখ করা আছে দেশের ৯৫.২ শতাংশ বিদ্যালয়েই তার অস্তিত্ব নেই। অথচ আইনটি বলবৎ হওয়ার পর দু বছর কেটে গেছে। এই আইনের প্রধান লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য তিন বছর সময় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাতে রয়েছে আর মাত্র একটি বছর। এর মধ্যে প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট গুণমান-সম্পন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। রিপোর্টে অনেক তথ্য সংকলন করা হয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিসংখ্যান হল—৯৯-৬৮ জন শিশু বিদ্যালয়ে কোনো না কোনো ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হয়। অনুমোদিত শিক্ষক পদের ৩৬ শতাংশই খালি পড়ে আছে এবং ৬.৭ লক্ষ শিক্ষক পেশাগত যোগ্যতার নিরিখে অযোগ্য।

চোরাবালি

১৭/১৭৯

দেশজুড়ে রমরমিয়ে চলছে বেআইনিভাবে নদীর চর থেকে বালি তোলার কাজ, রাজনৈতিক নেতা ও মাফিয়াদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা রাজ্য সরকারগুলিকে এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শত হস্ত দূরে রেখেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে বেআইনি বালি তোলা বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ-ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক করে। নির্দেশ অনুযায়ী পরিবেশ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ মাফিক বালি তুলতে গেলে, প্রয়োজন হবে এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কিত নিয়মাবলি মেনে চলা। কোর্ট বলেছে, নদীর বুক তথা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে যথেচ্ছভাবে বালি তোলার ফলে নদীর অবস্থাই বদলে যাচ্ছে। ফলে নদীর স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিচ্ছে। বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে, পরিবেশ, পশু পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে এবং সর্বোপরি জীববৈচিত্র হারাচ্ছে।

বালি স্পঞ্জের আস্তরণের মতো যা, ভূ-জল পূরণে সাহায্য করে। সব বালি তুলে ফেললে, আড়াআড়ি এবং খাড়াইভাবে জল চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বহু রাজ্যের হাইকোর্টই এই বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এখনও সাফল্য যৎসামান্য।

জমানো

১৭/১৮০

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'বীজ ব্যাঙ্ক' গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত। উদ্যোগ সাধু হলেও, শস্য-বৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বীজ ব্যাঙ্কই শেষ কথা নয়।অনেক উদ্ভিদ বীজ উৎপাদন করে না, তাই বীজ ব্যাঙ্কে কদাচিৎ এদের সংরক্ষণ করা হয়। বহু ক্ষেত্রেই বীজ ব্যাঙ্কগুলি বীজ জমিয়ে রাখার স্থানীয় জ্ঞান রেকর্ড করে রাখে না। অথচ বীজের মতোই সেই জ্ঞান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

প্রকৃতির পথ অনুসরণ করেই এই কাজ করা উচিত কারণ, প্রকৃতির মতো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আর কার আছে? উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকায় গত ১৫ বছর ধরে লক্ষ্য করা গেছে, বর্ষা ঋতুর মেয়াদ কমে যাওয়ায় সাবেক মিলেট বেড়ে ওঠার চক্রের সময়ও কমেছে। যুগ যুগ ধরে চাষিরা তাদের প্রয়োজনে বীজের উন্নতিসাধন করেছে। বাইরের কোনো জোগান যেমন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই তাদের তৈরি বীজ থেকে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে ২১ থেকে ৪৩ শতাংশ।

গঙ্গা মায়ি কী!! ১৭/১৮১

হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরও ভারতের মাতৃতুল্য গঙ্গার দূষণ বেড়েই চলেছে, কমছে ধারার পরিমাণ সম্প্রতি বারাণসীতে গঙ্গাতীরের বিভিন্ন জায়গায় 'গঙ্গা সেবা অভিযানম'-এর তরফ থেকে জমায়েত করা হয়। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 'দেবী পূর্ণাম্ভা' আমরণ অনশনে বসেন। একইভাবে অনশনে বসেন আরও অনেক সাধু। এদের মধ্যে অন্যতম 'দেবী শ্রদ্ধাম্ভা', স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ, গঙ্গা-প্রেমী ভিক্ষু, বনচারী কৃষ্ণপ্রিয় আনন্দ। সকলকেই এক এক করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। 'গঙ্গা সেবা অভিযানম'-এর আহ্বায়ক স্বামী অভিমুক্তে স্বরানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, যতক্ষণ না সরকারের ঘুম ভাঙে ততক্ষণ তাদের এই গঙ্গা-তপস্যা চলবে। তিনি বলেন, তাদের মূল দাবি ,উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গার প্রবাহ বাধামুক্ত করা হোক। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে বারাণসীতে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে তৎকালীন বন ও পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, সুপ্রাচীন গাঙ্গেয় সভ্যতাকে কখনই 'খালের সভ্যতা' হতে দেওয়া চলবে না।

লাল বাংলা? ১৭/১৮২

ভয়াল দূষণ সৃষ্টিকারী লাল তালিকাভুক্ত শিল্পের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পিছনে ফেলে দিয়েছে মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুকে। দেশের ৪৩টি শিল্প তালুককে ভয়ানক দূষণ সৃষ্টিকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বন ও পরিবেশমন্ত্রী জয়ন্তী নটরাজন এই বক্তব্য রেখেছেন। দূষণ মাপতে শিল্পগুলিকে যথাক্রমে লাল, কমলা ও সবুজ রঙে ভাগ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সংখ্যা অনুযায়ী লাল তালিকাভুক্ত শিল্পের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ১২,৮১০। তারপর যথাক্রমে মহারাষ্ট্রে ১২,১৮৪ এবং তামিলনাড়ুতে ১১,৬৫০।

ড্যাম ইট!! ১৭/১৮৩

ভারত সরকারের নির্দেশে তৈরি একটি রিপোর্টে গঙ্গার প্রধান দুটি উপনদী অলকানন্দা ও ভাগীরথীর উপর প্রস্তাবিত ৩টি বাঁধ নির্মাণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঁধগুলি তৈরি হলে উত্তরাখণ্ডের জীববৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের হয়ে রিপোর্টটি তৈরি করেছে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এছাড়া রিপোর্টে, গঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে আদর্শ জলের প্রবাহ নিশ্চিত করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটির মিটিংয়ের আগে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মেম্বার-সেক্রেটারি ও কানপুর আইআইটি-র অধ্যাপক জিডি আগরওয়াল উত্তরাখণ্ডে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির উপর বাঁধ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে অনশন শুরু করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অথরিটি মিটিং ডাকে বলে জানা গেছে।

ই কো .. কো .. কো.. ১৭/১৮৪

'ইকো ট্যুরিজম'ভালো না মন্দ এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। ইকো ট্যুরিজম সমর্থনকারীদের বক্তব্য, পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে এই ব্যাবসা আদর্শ। কারণ ইকো ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অরণ্য ও বনসম্পদ (প্রাণী ও উদ্ভিদ) সংরক্ষণ করতে সুবিধা হবে। রক্ষা পাবে বিপদাপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ। প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার ফলে মানুষের মধ্যে তার প্রতি টান তৈরি হবে। ফলে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে তারা আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হবে। তাছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায় আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে। আবার যারা এর বিরুদ্ধে, তারা বলছে এর জন্য যে পরিকাঠামো গড়তে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার কুপ্রভাব গিয়ে পড়ে অরণ্য, তার জীবজগৎ ও স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির উপর। বন কাটা হয়, স্থানীয় মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। জল ও শক্তি ভাঁড়ারে টান পড়ে। অরণ্যবাসীরা তাদের পরম্পরাগত জীবনধারা থেকে সরে এসে ট্যুরিস্টদের চাহিদা অনুযায়ী দোকানপাট বসায়। ভুলতে বসে তাদের যুগ যুগ ধরে সযত্নে লালিত সংস্কৃতি। ইকো ট্যুরিজম থেকে লাভবান হয় শুধু হোটেল মালিকরা। তাই ১৯৮৬ সাল খ্যাতনামা পরিবেশবিদ জয় ওয়েস্টারভেল্ট ইকো ট্যুরিজমকে 'গ্রিনওয়াশ' আখ্যা দিয়েছেন।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

আলো ১৭/১৮৫

বিগত বছরগুলিতে দেশে জৈব খাদ্যের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১ এই ৩ বছরে উৎপাদন ১.৬২ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৩.৮৮ মিলিয়ন টন। চাহিদা দেখে সরকারের জাতীয় হর্টিকালচারাল মিশন জৈব ফসল উৎপাদনকারীদের হেক্টর প্রতি ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে একজন চাষি সর্বোচ্চ ৪ হেক্টর জমিতে জৈব ফসল উৎপাদনের জন্য ৪০ হাজার টাকা পেতে পারে। এছাড়া কেঁচোসার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য খরচের ৫০ শতাংশ দেওয়া হবে। একজন চাষি সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পাবে—৫০ হেক্টর জমিতে জৈব ফসল উৎপাদনকারী দলকে সার্টিফিকেশনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্ধকার ১৭/১৮৬

শহরে, গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বত্র দেদার বিক্রি হচেছ চিপস, ভুজিয়া, নুডলস এর মতো প্যাকেটজাত খাবার সঙ্গে পেপসি, কোকাকোলা নানান পানীয়। শহরে বিক্রি হচ্ছে চিকেন ফ্রাইস ও বারগারের মতো খাদ্যবস্তু। এ সবই জাঙ্ক ফুডের আওতায় পড়ে। যার অর্থ হল এই ধরনের খাদ্য বা পানীয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট, চিনি ও নুন। পুষ্টিগুণহীন খাদ্যবস্তুগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কখনও ভুলবশত আবার বেশিরভাগ সময় ইচ্ছাকৃতভাবে জানায়না তাদের খাদ্যবস্তুতে ক্ষতিকারক বস্তুর পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কতটা বেশি। যেমন আমরা জানিনা সারাদিনে আমাদের যে পরিমাণ ফ্যাট ও নুন খাওয়া উচিত, এক প্যাকেট চিপসেই থাকে তার অর্ধেক। এক বোতল কোকাকোলা বা পেপসির মতো পানীয়ে যে পরিমাণ চিনি থাকে, একজন মানুষের দৈনিক চিনির চাহিদার মাপকাঠিতে তা দ্বিগুণ। এছাড়া কোনো কিছু ভাজলে যে 'ট্রান্স ফ্যাট' উৎপন্ন হয় বেশি হলে তার থেকে নানান জটিল ও মারাত্মক রোগ হয়। কিন্তু কোম্পানি যেহেতু 'খাদ্য ব্যাবসার' পরিবর্তে কেবল 'লাভের ব্যাবসা' করে নানান ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে তারা গোপন রাখতে চায় প্রকৃতপক্ষে তাদের তৈরি খাদ্যবস্তুতে স্বাস্থ্যহানিকর উপাদান কতখানি।

সম্পাদকের উদ্দেশে

|| **মাননীয়েষু** ||

পরিষেবার সঙ্গে পাঠানো কৃষি
বৃত্তান্ত 'অন্ন কথকতা' আপনার
পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এই
কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদ তথা
নিরীক্ষার প্রসারে ওপরই আমাদের
কার্যক্রমের সার্থকতা। আপনার
পাঠকের কাছে এই লেখা
পৌঁছোলে আমরা বাধিত হব।

সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদক || জুন ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু